ময়মনসিংহের জমিদারি ও ভূমিস্বত্ব
১৮৫৪-১৯৬০

ময়মনসিংহের জমিদারি ও ভূমিস্বত্ব
১৮৫৪-১৯৬০

মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
৫ পুরাতন সেক্রেটারি রোড, নিমতলী
রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ই-মেইলঃ asiaticsociety.bd@gmail.com

© বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

প্রকাশ কাল : মার্চ ২০১৮

মুদ্রণে :
বেঙ্গল কম-প্রিন্ট

মূল্য : ৭০০/-

ISBN: 978-984-93191-1-5

উৎসর্গ

আমার প্রাণপ্রিয়

সহধর্মিণী
কানিজ ফাতিমা,

পুত্র
আহমেদ ইশতিয়াক হাফিজ,

ও

কন্যা
ইফফাত ফারাহ

মুখবন্ধ

অবিভক্ত ময়মনসিংহ জেলা বাংলার এক প্রাচীন জনপদ। জনসংখ্যার বিচারে ময়মনসিংহ জেলা ছিল ব্রিটিশ ভারতের সর্বাধিক জনবহুল জেলা। ভূ-প্রকৃতিগত বৈচিত্র্যের দিক থেকে এ জেলা ছিল অনন্যসাধারণ। জনসংখ্যার বিশালত্ব, ভূমির প্রাচীনতা ও বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা ছাড়াও এ জেলা বংশপরম্পরায় আমার জন্মস্থান হওয়ার কারণে 'ময়মনসিংহ জেলার জমিদারি ও ভূমিস্বত্ব ১৮৫৪-১৯৬০' শীর্ষক গ্রন্থ রচনা আমায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

সুদুর অতীত হতে বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের মূল পেশা ছিল কৃষি। কৃষির মূল ভিত্তি ছিল ভূমি। বাংলার জনজীবনে ভূমির অপরিসীম গুরুত্ব থাকায় ইতিহাসের ধাপে ধাপে তাই রাষ্ট্র ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভূমির ওপর নানা মাত্রায় অধিকার বা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় তহবিলের অন্যতম প্রধান উৎস ভূমিরাজস্ব আহরণের পন্থা হিসেবে বাংলার ভূ-প্রাকৃতিক দুর্গমতা, কৃষি ফলনে আবহাওয়ার চিরন্তন খামখেয়ালিপনাজনিত অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় মোগল বাংলায় 'জমিদারওয়ারি' ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে ওঠে; যদিও ভারতের অন্যত্র প্রধানত 'রায়তওয়ারি' ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই অনুসৃত হয়। এদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট অমিল থাকলেও এ দু'যুগেই ভূমির ওপর চাষি-প্রজার মালিকানা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছিল। জমিদার ও তালুকদার শ্রেণি ছিল সরকার কর্তৃক ভূমিকর আদায়ের জন্য নিযুক্ত কমিশনভিত্তিক কর্মকর্তা। তারা নির্ধারিত রাজস্ব আদায় ছাড়াও চাষি প্রজার সাথে সমঝোতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে সরকার ও চাষির মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতেন। মধ্যযুগ পর্যন্ত গ্রাম বাংলার আর্থসামাজিক জীবন ছিল এ ধারাবাহিকতায় বহমান। গ্রামবাংলায় প্রচলিত এ আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দেয় ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থা। ভূমির ওপর হাজার বছর ধরে চলে আসা চাষির মালিকানাস্বত্ব হরণ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে জমিদারদের অর্পণ করা হয়। জমির ওপর সকল অধিকার হারিয়ে চাষি-প্রজা জমিদারের 'উঠবন্দি রায়তে' পরিণত হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে মধ্যভারতে জমিদারি প্রথা প্রচলিত হলেও বাংলায় তা প্রচলিত হয় মোগল আমলে। এ আমলে বাংলায় জমিদারি কাঠামোতে যেমন ছিল প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলোর ঐতিহাসিক উত্তরণ, তেমনি ছিল সম্রাট, সুবাদার, নবাবগণের বিশ্বস্ত আমির, ওমরাহ, সেনানায়ক ও কর্মচারী এবং দেশীয় রাজারাজরা ও জমিদারগণের অধীনস্থ আমলাদের উত্তরণ। ব্রিটিশ শাসনকাল জমিদারি কাঠামোয় নুতন এক শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটায়। তারা ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির সহযোগী দালাল, মৎসুদ্দি, ফড়িয়া হিসেবে কর্মরত পেশাজীবী যারা মূলত ব্রিটিশ শাসক, শোষক ও লুঠেরাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠা নব্য ধনীক শ্রেণি। ব্রিটিশ রাজস্বনীতিতে প্রাক-ব্রিটিশ জমিদারিগুলো পাইকারি হারে নিলামে বিক্রি শুরু হলে জমিদারি কিনে এরা জমিদার শ্রেণিতে উন্নীত হয়। জমিদার শ্রেণিতে উত্তরণের আরেক দল ছিল যারা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় 'রায়ত খাদক রায়ত' তারা নানাভাবে মহাজনি কায়দায় রায়ত শোষণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে জমিদার হয়ে ওঠেন। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণি যেমন ব্যবসায়ী, উকিল, সরকারি কর্মকর্তা, শিল্পপতি, রাজনৈতিক নেতা, জোতদার, সুদখোর, ব্যবসায়ী, মহাজন তাদের অর্জিত সম্পদ দ্বারা নিয়মিত প্রক্রিয়ায় জমিদার শ্রেণিভুক্ত হন।

ময়মনসিংহে প্রাক-ব্রিটিশ জমিদারি ছিল মাত্র ১৭টি, হিস্যাদার ছিলেন ৪১ জন। ব্রিটিশ শাসনকালে নিলাম, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি নানা প্রক্রিয়ায় শেষাবধি জমিদারি সংখ্যা দাঁড়ায় দশ সহস্রাধিক। সারা ব্রিটিশামলব্যাপী জমিদারির উত্থান-পতন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। শতাধিক বছর ধরে চলে জমিদারি ভাঙাগড়ার এ খেলা। ময়মনসিংহে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বাংলার বারোভূইয়া (বারভূঞা) নেতা ঈশা খাঁনের বংশধরগণের মালিকানাধীন জমিদারিগুলো। এক সময়ে ময়মনসিংহের ২২টি পরগনাই তাদের অধীনে ছিল। তবে বেশ কিছু বড়ো জমিদারি সারা ব্রিটিশ আমল জুড়েই বিদ্যমান ছিল। সূর্যাস্ত আইনে ছোটো-বড়ো কত জমিদার যে জমিদারি হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হয়েছে তার সঠিক ইতিহাস পাওয়া কঠিন। প্রাক-ব্রিটিশ জমিদারিসহ পরবর্তীকালে নানা

প্রক্রিয়ায় জমিদারি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত জমিদারদের উত্থান-পতন এবং জমিদারির মালিকানা হস্তান্তর এ গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে সবিস্তারে বর্ণনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে জমিদারের একচ্ছত্র মালিকানায় ভূমিতে রায়তের অধিকার শূন্যে পৌঁছায়। এমনকি এ আইনে ভূমিতে রায়তের দখলিস্বত্বকেও অগ্রাহ্য করা হয়। ইতোমধ্যে রায়ত ও জমিদারের মাঝে নানা অবয়বে প্রতিষ্ঠিত হয় মধ্যস্বত্বশ্রেণি। জমিদার, তালুকদার ও মধ্যস্বত্ব শ্রেণি এবং তাদের নায়েব-গোমস্তার অত্যাচার ও শোষণে রায়তশ্রেণি ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে ভূমিদাসের পর্যায়ে অবনত হয়। এ অবস্থায় রায়তশ্রেণির প্রতি কিছুটা দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়ায় তাদের পরিত্রাণে সময়ে সময়ে নানা আইনকানুন যেমন- ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের খাজনা আইন, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এবং পরবর্তীকালে এ আইনের সংশোধনী প্রণয়ন করে রায়তের কিছু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে ময়মনসিংহসহ সারা বাংলায় উপরিস্থ স্বত্ব (জমিদারি), মধ্যস্বত্ব (তালুকদারিস্বত্ব ও অন্যান্য স্বত্ব) এবং নিম্নস্ত স্বত্ব (রায়তিস্বত্ব) এ তিন স্তরে ভূমিস্বত্ব বিভাজিত হয়। তবে এ ত্রিস্তরেও রকমফের ছিল প্রচুর। এ গবেষণা গ্রন্থে ব্রিটিশ ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্বের এ বিষয়গুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশবিভাগের পর জমিদারি উচ্ছেদ করে পূর্ণমাত্রায় রায়তি বা প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে থাকবাস্ত জরিপের পর হতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারি উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা অবধি ময়মনসিংহে জমিদারিসহ সকল ভূমিস্বত্বের গঠন, ধরন, প্রকৃতি, হস্তান্তর ও বিলিবন্টনে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এ গ্রন্থে তা দালিলিক প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; যা এদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ গবেষণাকর্মে নিয়োজিত হওয়ার পেছনে একটি পূর্বপ্রেক্ষিত রয়েছে। সিলেট জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ধীরে ধীরে সিলেট ও বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মে। যেহেতু সিলেট ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই এ জেলার ভূমি ব্যবস্থা ছিল কিছুটা ভিন্নতর। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে "সিলেট বিভাগের ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থা" শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীন এ গ্রন্থের উপর একটি সমালোচনা লিখেন এবং ইতিহাস বিভাগের জার্নালে তা প্রকাশিত হয়। এভাবেই অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীনের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মে ভর্তি হয়ে এ গবেষণা সম্পন্ন করি। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণিত পিএইচ.ডি গবেষণাকর্মে ভর্তির সময় আমি দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলাম। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে বান্দরবান পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (এপিডি), বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ও রাজশাহী বিভাগের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। চাকরি জীবনে এ সকল ব্যস্ততম পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে এ গবেষণাকর্মে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার মতো সুযোগ আমার ছিল না। কাজেই মাঝেমধ্যে কিছুটা অবসর সময় গবেষণা কাজে ব্যাপৃত হতে পারতাম। এজন্য গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমার অধিক সময় লেগে যায়। বস্তুত উক্ত গবেষণা শেষে যে অভিসন্দর্ভ পেশ করা হয় তা কিছু পরিবর্তিত আকারে বর্তমান গ্রন্থের রূপ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. কে এম মোহসীনের তত্ত্বাবধানে বর্ণিত বিষয়ের ওপর মূল অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এ কাজ করার জন্য তাঁর নিরন্তর প্রণোদনা ও নিরলস সহযোগিতা আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। এ বিষয়ের ওপর তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ নির্দেশনা, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান এবং আন্তরিক সহযোগিতার ফলে অভিসন্দর্ভটি বর্তমান গ্রন্থরূপ পেয়েছে। এ জন্য তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যাঁর উৎসাহ, পরামর্শ ও উদার সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণা চালিয়ে যাওয়া ও এ গবেষণাগ্রন্থ রচনা করা আমার জন্য দুরূহ ছিল তিনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ। আমার প্রচণ্ড ব্যস্ত কর্মজীবনে প্রায়শ এ গবেষণা ও অভিসন্দর্ভ রচনা যখন দুষ্কর ও অসম্ভব মনে হতো; এমন কি গবেষণাটি বন্ধ করার কথা ভাবতাম- তখন তিনি আমায় এ কাজে ধৈর্য্য সহকারে নিবিষ্ট থাকার জন্য উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন। তা-ছাড়া, তিনি বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসের পরিচালক থাকাবস্থায় আমাকে আর্কাইভস ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন; মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড ও পুস্তক দিয়ে সহায়তা করেছেন। সর্বোপরি এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে তিনি নানাভাবে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ গবেষণা পরিচালনা ও এ গ্রন্থ রচনায় আমি অনেক সহকর্মীর যথেষ্ট সহযোগিতা লাভ করেছি। ময়মনসিংহ জেলার তদানীন্তন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব সাজ্জাদুল হাসান (বর্তমানে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়), জনাব রাশেদুল হাসান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রেকর্ডরুম, (বর্তমানে উপসচিব) ময়মনসিংহ রেকর্ডরুমে গবেষণায় আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসের উপপরিচালক সালমা ইসলাম, সিনিয়র আর্কিভিস্ট আলী আকবর, গবেষণা কর্মকর্তা মরহুম মোঃ আতিয়ার রহমান মিঞা ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ দলিল, রেজিস্টার, রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। বাংলাদেশ সচিবালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা-এর গ্রন্থগারিক বেগম সামসুন্নাহার খান আমাকে লাইব্রেরির মূল্যবান গেজেটিয়ার ও অন্যান্য গ্রন্থাদি দিয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ড. চিত্রলেখা নাজনীন বর্তমানে এ কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অভিসন্দর্ভ মুদ্রণ কাজে আমায় সহযোগিতা করেছেন বান্দরবান জেলা প্রশাসকের গোপনীয় সহকারী মোঃ আমিন উল্লাহ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সহকারী শফিকুল ইসলাম এবং কমিশনার, রাজশাহী বিভাগের গোপনীয় সহকারী মোঃ নূরুল মোমেন। বেঙ্গল কম-প্রিন্ট এর প্রোপ্রাইটর ও কর্মচারীবৃন্দ গ্রন্থটি মুদ্রণে প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ দীর্ঘ সময় গবেষণা কাজ নির্বিঘ্নভাবে চালিয়ে যাওয়া ও এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে যিনি নিরলস অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দিয়ে আসছেন, সংসারের গুরুভার হতে আমায় অব্যাহতি দিয়ে সকল দায়িত্ব নিজ কাঁধে বহন করে চলেছেন, তিনি আমার স্ত্রী কানিজ ফাতিমা। তাঁর ঐকান্তিক ও আন্তরিক উৎসাহ ছাড়া এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হতো না। আমার পুত্র প্রকৌশলী আহমেদ ইশতিয়াক হাফিজ এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ও কম্পোজে সহযোগিতা করেছে। চাকরিজীবনের যে মুহূর্তগুলো আমার কাছে অবসর বলে মনে হতো তার প্রায় সবটুকুই এ গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যয় করেছি। এ দুর্লভ মুহূর্তগুলোর সাহচর্য হতে আমার সহধর্মিনী কানিজ ফাতিমা, পুত্র আহমেদ ইশতিয়াক হাফিজ ও কন্যা ইফ্‌ফাত ফারাহকে বঞ্চিত করেছি। তাঁদের ধৈর্য, ত্যাগ, উৎসাহ ও সহযোগিতার ফলে এ গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে গ্রন্থটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল এবং প্রকাশনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ও প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ময়মনসিংহ জেলার শতাধিক বছরের ভূমিস্বত্বের ইতিহাস রচনায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে অতীতকে দেখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তারপরও যদি কোন তথ্যগত দূর্বলতা থাকে, পরবর্তী সংস্করণে এগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

মোঃ হাফিজুর রহমান ভূঞা

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	vii
ভূমিকা	xiii
মানচিত্র	xxiii
প্রথম ভাগ : ময়মনসিংহ জেলা ও ভূমি প্রশাসন কাঠামো	
প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি	
সাধারণ পরিচিতি ও সীমানা	০১
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য	০২
জেলা গঠন ও সীমানা পরিবর্তন	০৪
জনসংখ্যা	০৭
কৃষি	০৯
ইতিহাস	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়: ভূমিপ্রশাসন কাঠামো	
প্রাক ব্রিটিশ ভূমি প্রশাসন কাঠামো	১৯
ব্রিটিশ ভূমি প্রশাসন কাঠামো	২৫
দ্বিতীয় ভাগ : ময়মনসিংহের জমিদারি	
প্রথম অধ্যায় : ময়মনসিংহের জমিদারিসমূহের ইতিবৃত্ত	
মোগল আমল	৩৫
নবাবি আমল	৩৬
ব্রিটিশ আমল	৩৭
শুরুকালীন উল্লেখযোগ্য জমিদারিসমূহ	৩৭
জেলার প্রথম ভূমি বন্দোবস্ত	৪০
পঞ্চসনা বন্দোবস্ত	৪০
রটনের বন্দোবস্ত	৪১
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	৪২
জমিদারি পরিসংখ্যান	৪৩
জমিদারিতে হিন্দু মুসলিম অনুপাত	৪৬
তৌজি সংখ্যা	৫০
কোর্ট অব ওয়ার্ডসের আওতায় জমিদারিসমূহ	৫১
নিষ্কর এস্টেটস	৫৪
সরকারি খাস এস্টেটস	৫৪
ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্বের বৈশিষ্ট্য	৫৪
ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহের জমিদারির উত্থান পতন	৫৫
ময়মনসিংহে বিদেশি জমিদার	৬১
ময়মনসিংহ জেলায় ভিন্ন জেলার জমিদারির অধিকার/অংশ	৬১
জমিদারগণের জনহিতকর কার্যক্রম	৬২

পৃষ্ঠা

জমিদার রায়ত সম্পর্ক ৬৬
বিদ্যমান জমিদারি ভবনসমূহের অবস্থা ৭৩

পাকিস্তান আমল

জমিদারি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও প্রজাস্বত্বের প্রতিষ্ঠা ৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : ময়মনসিংহের পরগনাওয়ারি জমিদারির বিবরণী

পরগনা, মহাল, জমিদারি ও এস্টেট ৭৯
পরগনা আটিয়া ৮২
পরগনা আলাপসিংহ ৮৮
পরগনা কাগমারি ১০২
পরগনা খালিয়াজুরি ১০৭
পরগনা জফরশাহী ১১০
পরগনা জোয়ানশাহী (তপ্পে লতিবপুরসহ) ১১২
তপ্পে কুড়িখাই ১১৬
পরগনা নসিরুজিয়াল ১১৮
পরগনা পুখুরিয়া ১২৩
পরগনা বড়বাজু ১২৬
পরগনা ময়মনসিংহ ১২৯
পরগনা রণভাওয়াল ১৫১
পরগনা শেরপুর (পরগনা সাগরদি সহ) ১৫৪
পরগনা সুসঙ্গ ১৬৩
পরগনা হাজরাদী ১৭৬
পরগনা হোসেনশাহী ও জোয়ার হোসেনপুর ১৮১
ক্ষুদ্র পরগনাসমূহ ১৮৪

তৃতীয় অধ্যায় : জমিদারি হস্তান্তরের সারসংক্ষেপ

জমিদারি হস্তান্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ১৮৯
পর্যালোচনা ১৯৯

তৃতীয় ভাগ: ময়মনসিংহের জমিদারি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

প্রথম অধ্যায় : জমিদারি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা (সরকারি)

মোগল জমিদারি ব্যবস্থাপনা ২০৩
ব্রিটিশ জমিদারি ব্যবস্থাপনা ২০৪
সরকারি রেজিস্টার ২০৫
ময়মনসিংহ কালেক্টরেটের জমিদারি রেজিস্টার ২০৬
রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ২০৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : জমিদারি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা (অভ্যন্তরীণ)

ময়মনসিংহের জমিদারিসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ২০৯

তৃতীয় অধ্যায় : মহারাজা এস্টেটের প্রশাসন ব্যবস্থাপনা (কেইস স্টাডি)

মহারাজা এস্টেটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ২১৪

পৃষ্ঠা

জমিদারি প্রশাসন ২১৫
জমিদারি বাজেট ২২৭

চতুর্থ ভাগ : ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্ব বিশ্লেষণ

প্রথম অধ্যায় : ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্ব

ময়মনসিংহের আদি ভূমিস্বত্ব ২৩৩
জমিদারি স্বত্ব ২৩৪
তালুকি স্বত্ব ২৩৫
তালুকের শ্রেণিবিন্যাস ২৩৬
রায়তি স্বত্ব ২৪০
ময়মনসিংহের বিভিন্ন শ্রেণির রায়ত ২৪০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্ব নির্ধারণ (জরিপ) কার্যক্রম

থাকবাস্ত জরিপ ২৪৩
রাজস্ব জরিপ ২৪৪
কিস্তোয়ার জরিপ ২৪৪
আংশিক বিচ্ছিন্ন এলাকার পাঁচ থানায় জরিপ কার্যক্রম ২৪৬

তৃতীয় অধ্যায় : ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্বের পরিসংখ্যান

জমিদারি পরিসংখ্যান ২৪৭
মধ্যস্বত্বের পরিসংখ্যান ২৪৯
রায়তের পরিসংখ্যান ২৫২
জমিদারি স্বত্ব, মধ্যস্বত্ব ও রায়তিস্বত্বের সংখ্যা ২৫৪

চতুর্থ অধ্যায় : মৌজাভিত্তিক ভূমিস্বত্ব পর্যালোচনা

মৌজান্তরের ভূমিস্বত্বের বিশ্লেষণ ২৫৭
উপরিস্থ স্বত্ব ২৫৮
মধ্যস্বত্ব ২৫৯
নিম্নস্থ (রায়তি) স্বত্ব ২৬৪
খাজনা ২৬৫
তথ্য পর্যালোচনা ২৬৬
মৌজান্তরে ভূমিস্বত্ব বিশ্লেষণের সারসংক্ষেপ ২৬৮

উপসংহার ২৬৯

শব্দ পরিচিতি ২৭৫
পরিশিষ্ট ২৮৩
গ্রন্থপঞ্জি ৩৩২
নির্ঘণ্ট ৩৩৯

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে কৃষির সূচনালগ্নে ভূমির ওপর অধিকার বা স্বত্বের উদ্ভব হয়। কালক্রমে কৃষির বিস্তার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভূমিস্বত্বের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রজাত নব প্রজন্ম কৃষি ও আবাসিক প্রয়োজনে অরণ্য পরিষ্কার করে ক্রমশ ভূমিকে আবাদযোগ্য এবং সেখানে নতুন বসতি গড়ে তুলে। বিনয় ঘোষের মতে সেকালে ভূমির উপর গোষ্ঠীস্বত্ব, সংঘস্বত্ব ও যৌথস্বত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এসব প্রথা শিথিল হয়ে আসে এবং এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থ '*মনুসংহিতায়*' ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্বের সুস্পস্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যায় প্রাচ্যের গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায়ও বাংলা ভাষাভাষী সমাজে একইভাবে ভূমিতে ব্যক্তিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ভূমি ব্যবহার ভূমিস্বত্বের ওপর প্রতিযোগিতামূলক প্রভাব ফেলে। ভূমির দখলাধিকার নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়। কালক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়োজনেই সম্ভবত জাতিসমূহে রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সমন্বয়ে বৃহদায়তন এক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। রাজকীয় প্রশাসন তখন উৎপাদন ও আয়ের একমাত্র উৎস ভূমি ও এর ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তহবিল গঠনের অজুহাতে রাজস্ব আরোপের জন্য কৃষকের উৎপন্ন ফসলের ওপর ভাগ বসায়। এভাবে ব্যক্তি ও পরিবারস্তরের আঙিনা ছাড়িয়ে ভূমি রাজকীয় নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে রাজা ও প্রজার মাঝে জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি নানা প্রকারের মধ্যস্বত্বভোগীর অভ্যুদয় ঘটে। পরবর্তীকালে রাজা, প্রজা ও মধ্যস্বত্বভোগীদের মাঝে ভূমি মালিকানা, ভূমি হস্তান্তর, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণে বহুরূপে এদেশে আবির্ভূত হয়।

তবে প্রাক-ব্রিটিশ ভূমি ব্যবস্থায় জমিদার, তালুকদারগণ শুধু রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন, ভূমির ওপর তাদের আইনগত তেমন কোনো অধিকার বা মালিকানা ছিল না। মালিকানা ছিল ভূমির প্রকৃত ব্যবহারকারী কৃষক ও প্রজার। তবে রাজস্ব আদায় করার সুবাদে ভূমি মালিকগণের ওপর এক ধরনের কর্তৃত্ব জমিদার বা তালুকদারদের ছিল। এভাবে প্রাক-ব্রিটিশ আমলে রাজকীয় স্বত্ব, মধ্যস্বত্ব এবং নিচস্থ স্বত্ব এ ত্রিস্তরে ভূমিস্বত্ব বিভাজিত ছিল। তবে ভূমির ওপর নিচস্থ স্বত্ব অর্থাৎ চাষি/প্রজার স্বত্ব ছিল মালিকানার, রাজা ও মধ্যস্বত্বভোগীর স্বত্ব ছিল চাষি হতে রাজস্বপ্রাপ্তির। এ সহজ সরল ধারাটি ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে ভেঙে পড়ে।

ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থা জাতীয় ইতিহাসের এক বিশাল অধ্যায়। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের প্রেক্ষিতে বাংলায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়। বিজয়ের পরপর কোম্পানি সুকৌশলে মীরজাফরকে পুতুল নবাব বানিয়ে অতি ক্ষিপ্রতার সাথে রাষ্ট্রশক্তির পুরো নিয়ন্ত্রণ তার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়। বিজয় স্থায়ীকরণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন ছিল দেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী এক বৃহদাকার সেনাবাহিনী গঠন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অফুরন্ত অর্থ বৈভবের। আর এ বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগানের মতো তাদের তেমন কোনো অবলম্বন ছিল না। এজন্য মধ্যযুগীয় রাজনীতিতে অর্থ ও ক্ষমতার মূল উৎস 'ভূমি রাজস্বের' প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে।

অতি চাতুর্যের মাধ্যমে তারা ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে নামমাত্র মোগল সম্রাট শাহ আলম এর নিকট থেকে বাংলার 'দেওয়ানির সনদ' লাভ করতে সমর্থ হয়। তারপর শুরু হয় বিদ্যমান জমিদারিগুলো হতে যে কোনোভাবে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের জন্য নানা কূটকৌশল। প্রাথমিকভাবে তারা জমিদারিগুলো নিলামে সর্বোচ্চ ডাককারীদের কাছে

বন্দোবস্ত প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করে। এ প্রক্রিয়ায় বনেদি জমিদার পরিবারগুলো হতে অধিকাংশ জমিদারি চলে যায় কোম্পানির বেনিয়া, দালাল ও তাদের সহযোগী নব্য ধনিকশ্রেণির হাতে; যাদের জমিদারি পরিচালনার দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে নিলাম ডাক আশাতীত হলেও তাদের কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং রাজস্ব আদায় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তন করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে গুটিকতক জমিদার পরিবারের হাতে কোটি কোটি মানুষের ভূ-সম্পত্তির মালিকানা ন্যস্ত করা হয়। ফলে বাংলার গণমানুষের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ভূমি অঙ্গনে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শত শত বছর ধরে চলে আসা জমিদার ও চাষি প্রজার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ভেঙে যায়। জমিদারশ্রেণি ধনসম্পদে ও আধিপত্যে স্ব স্ব এলাকায় পুরোপুরি স্বৈরাচারী শোষকের অবয়বে আবির্ভূত হন। কৃষকপ্রজা জমির ওপর তাদের জন্মগত মালিকানাস্বত্ব হারিয়ে জমিদারের কৃপার পাত্র 'রায়তে' পরিণত হয়। জমিদার শ্রেণি নিজেদের সকল প্রকার ঝক্কি ঝামেলা এড়িয়ে সর্বাধিক আয় নিশ্চিত করতে তাদের অধীনে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাত্রার মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে। মধ্যস্বত্বাধিকারীরা নিজ নিজ এলাকায় ছোটোখাটো জমিদার হয়ে যায়। কালক্রমে মধ্যস্বত্ব নানা শাখাপ্রশাখায় বিন্যস্ত হয় এবং একপর্যায়ে গোটা গ্রামীণ সমাজকে জালের ন্যায় পরিবেষ্টন করে ফেলে। প্রতিটি এলাকার সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক জীবন এ সমস্ত জমিদার, তালুকদার এবং নানা অবয়বে আবির্ভূত মধ্যস্বত্বভোগীদের ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। এদিকে বংশানুক্রমিকভাবে অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বিভিন্নস্তরের ভূমিস্বত্ব (জমিদারি ও তালুকদারি স্বত্ব, মধ্যস্বত্ব) হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যার ফলে এক জমিদারির পতন ও আরেক জমিদারির উদ্ভব ঘটে। এমনিভাবে পরিবার হতে পরিবারে জমিদারিস্বত্ব স্থানান্তরের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ইতিহাস এগুতে থাকে। সারা ব্রিটিশ শাসনামল জুড়ে সরকার, উপরিস্বত্ব, ও মধ্যস্বত্ব, সকল স্তরেই দান, ক্রয়-বিক্রয়, নিলাম, ইজারা, সরকারের পুনঃগ্রহণ ইত্যাদি ভূমিহস্তান্তরের নানা প্রক্রিয়া, জমিদারি, মধ্যস্বত্ব ও রায়তি অধিকার নিয়ে বিরোধ এবং এতদসংক্রান্ত মামলামোকদ্দমা ও আইনগত জটিলতায় গ্রামীণ জীবনব্যবস্থা সরকারি অফিস, কোর্ট-কাছারি, উকিল, মোক্তার, ও জমিদারি সেরেস্তায় ঘুরপাক খেতে থাকে। জমিদার, মধ্যস্বত্বভোগী এবং তাদের নায়েব, গোমস্তা ও লাঠিয়ালদের অত্যাচার, শোষণ ও নানাবিধ মামলা মোকদ্দমার আবর্তে পড়ে চরম দারিদ্র্যক্লিষ্ট রায়তকুল দিশেহারা অবস্থায় অসহনীয় জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

বেশ দেরিতে হলেও রায়তশ্রেণির এ অবস্থা অবলোকন করে তাদের প্রতি কিছুটা দায়িত্ববোধ জাগ্রত হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কিছু আইনকানুন, যেমন ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দের খাজনা আইন, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এবং পরবর্তীকালে এ আইনের বেশকিছু সংশোধনী প্রণয়ন করে জমির ওপর সীমিত আকারে রায়তিস্বত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। ব্রিটিশ শাসনের শেষপর্যায়ে ভূমির ওপর জমিদার, মধ্যস্বত্ব এবং রায়ত এ তিন শ্রেণির সুনির্দিষ্ট স্বত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় ব্রিটিশ শাসনের শেষ দু'দশকে রায়ত ভূমির মালিকানা না পেলেও ভূমির ওপর মোটামুটি দখলাধিকার ও নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদানের অধিকারসহ বেশ কিছু মৌলিক স্বত্বাধিকার ফিরে পায়। দেশবিভাগের পর সকল জমিদারি উচ্ছেদ করে পূর্ণমাত্রায় প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। অবসান হয় ভূমিতে বহুমাত্রিক স্বত্বের জটিলতা।

ব্রিটিশ ভূমিব্যবস্থায় সরকারের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রতিটি জেলা কালেক্টরেট। বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়ায় প্রতিটি কালেক্টরেটে রাজস্ব আদায় হতো এবং এখান থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসৃষ্ট জমিদার নামক ভূস্বামীদের সকল প্রকার সরকারি সহযোগিতা ও সমর্থন নিশ্চিত করা হতো। জেলার জমিদারি, এস্টেট ও এগুলোর মালিকানার হালনাগাদ তালিকা, জমিদারদের নিকট হতে রাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ, জমিদারি বা তার অংশবিশেষ

ক্রয়-বিক্রয়, দান, নিলাম, উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনো প্রকারে হস্তান্তর ও হস্তান্তরিত জমিদারির নামজারি এবং এতদসংক্রান্ত মামলামোকদ্দমা নিষ্পত্তি, জমিদার রায়ত বিরোধ নিষ্পত্তি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সরকারি আদেশ নিষেধ প্রয়োগসহ এ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কালেক্টরেট হতে পরিচালনা করা হতো। আবার এই কালেক্টরেট প্রশাসনের মাধ্যমেই পাকিস্তান আমলে জমিদারি অধিগ্রহণ কার্যাদি সম্পন্ন হয় এবং অধিগৃহীত জমিদারির ক্ষতিপূরণ জমিদারদের পরিশোধ করে জমির মালিকানা কৃষক প্রজার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। প্রতি কালেক্টরেট রেকর্ডরুমে এতদসংক্রান্ত শতাধিক বছরের কার্যক্রমের নথিপত্র এখনো সংরক্ষিত রয়েছে। শুধু এগুলোই নয়, প্রাক ব্রিটিশ আমলের ফারসি ভাষায় মূল দলিল ও রের্কড-পত্রাদিও কালেক্টরেট রের্কডরুমে সংরক্ষিত আছে। এগুলো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তবে এগুলোর সংরক্ষণমান দুঃখজনকভাবে খুবই নিম্নমানের। যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করায় ইতোমধ্যে অনেক রেকর্ড/তথ্য বিনষ্ট হয়েছে অথবা হারিয়ে গিয়েছে। বাকিগুলোও দ্রুত বিনষ্টের পথে। তবে এখনো যা আছে এগুলো জেলার ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার। অপরদিকে জেলার জমিদারিগুলোর নিজস্ব রেকর্ড/ কাগজপত্রের সিংহভাগ জমিদারি অধিগ্রহণের পরপরই বিনষ্ট হয়েছে। দৃষ্টিনন্দন জমিদারি ভবনগুলোর বেশিরভাগই এখন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত। এমতাবস্থায় জেলা পর্যায়ে শতাধিক বছর ধরে ভূমি ব্যবস্থার সঠিক ইতিহাস বিনির্মাণের নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র এখনো যতটুকু বিদ্যমান আছে, তা অবলম্বনে গবেষণার এখনি সম্ভবত শেষ সময়। এতে যতই সময় পেরোবে ততই তথ্য প্রমাণের অভাবে জেলা ইতিহাসের অসম্পূর্ণতার আশঙ্কা বাড়বে এবং নির্ভরযোগ্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সুযোগ হ্রাস পেতে থাকবে। তাই অবিলম্বে জেলার ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষকগণের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। বর্তমান গবেষণাগ্রন্থটি এ প্রচেষ্টারই একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের গারো পাহাড় ঘেঁষে পূর্ব পশ্চিম দু-ধারে মেঘনা ও যমুনা; এ দুবৃহৎ নদী পরিবেষ্টিত ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত ছিল ময়মনসিংহ জেলা*। আদিযুগে এটি 'প্রাগজ্যোতিষ' ও পরবর্তীকালে 'কামরূপ' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল[১]। ময়মনসিংহ ভূখণ্ডের অংশবিশেষ রাজনৈতিকভাবে বাংলায় অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় আনুমানিক একাদশ শতাব্দী থেকে। মধ্যযুগে এই ভূখণ্ড মুসলিম শাসনাধীনে আসে। ব্রিটিশ শাসনকালে এটি ময়মনসিংহ জেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। উঁচুনিচু, পাহাড়, টিলা, জলাভূমি, নদনদী, হাওর, বনাঞ্চল, ফসলি জমি প্রভৃতি বিবিধ রকম ভূমিরূপ এ জেলায় বিদ্যমান। যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাসহ অসংখ্য ছোটো-বড়ো নদনদীর পলিমাটিসমৃদ্ধ উর্বরা জমির আকর্ষণে ময়মনসিংহ জেলায় সুদূর অতীত হতেই বিপুল সংখ্যক মানুষের অভিবাসন শুরু হয় এবং কালক্রমে মানববসতির আধিক্য ঘটে। এভাবে ব্রিটিশ ভারতে জনসংখ্যার দিক থেকে ময়মনসিংহ বৃহত্তম জেলায় পরিণত হয়। বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপ, জনসংখ্যার আধিক্য, পলিমাটিসমৃদ্ধ উর্বরা জমির বদৌলতে উৎপাদিত ফসলের প্রাচুর্য, সচ্ছল জনজীবনপ্রসূত লোকসংস্কৃতির স্বর্ণভাণ্ডার, ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন, মধ্যযুগ ও ব্রিটিশ আমলের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ঘটনাপঞ্জির সূতিকাগার, প্রাচীনকাল থেকে ভূমি ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ইত্যাদি নানান বিষয় বিবেচনায় ময়মনসিংহ অনন্য বৈশিষ্ট্যময় জনপদ।

ময়মনসিংহ এলাকা মোগল আমলে ঈশা খাঁনের মালিকানাধীন '২২-পরগনার' অন্যতম প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিগণিত হয়। ময়মনসিংহের অধিকাংশ পরগনা উক্ত ২২-পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশা খাঁনের মৃত্যুর পর একশত

---

* ময়মনসিংহ জেলা বলতে ব্রিটিশ আমলের ময়মনসিংহ জেলা (বর্তমান ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণাকে নিয়ে জেলা) বুঝাবে।

১ F. A. Sachse, *Bengal District Gazetteers, Mymensingh*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1917 (অতঃপর *Gazetteers, Mymensingh* লিখা হবে), p. 22

বছরের মধ্যেই ময়মনসিংহের সিংহভাগ এলাকা তার উত্তরাধিকারীগণের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং কালক্রমে বিভিন্ন জমিদারের হস্তগত হয়। মুর্শিদকুলী খানের আমলে এ জেলায় দুটি বৃহৎ হিন্দু জমিদারি যথা আলাপসিংহ (মুক্তাগাছা) ও ময়মনসিংহ (গৌরীপুর) জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলো বংশপরম্পরায় জমিদারি উচ্ছেদ অবধি পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিত থাকে। ব্রিটিশ আমলে জেলার বিভিন্নস্থানে নতুন কয়েকটি জমিদারির উদ্ভব হয় এবং বিকাশ লাভ করে। স্থানীয় জমিদার ছাড়াও ঢাকার নওয়াব পরিবার, মানিকগঞ্জের আধাঁরমাণিক, ধানকুড়া ও বালিয়াতির জমিদার পরিবার এবং রাজশাহীর কতিপয় জমিদার পরিবারের ময়মনসিংহে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি ছিল। তা ছাড়া সুসঙ্গ, শেরপুর, করটিয়া, জঙ্গলবাড়ীসহ ঐতিহ্যবাহী জমিদার পরিবারগুলোও সারা ব্রিটিশ আমল জুড়ে টিকে ছিল।

পূর্ব হতেই ময়মনসিংহে জমিদারিস্বত্বের পাশাপাশি নানাধরনের তালুকিস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় অনেক স্বাধীন (হুজুরি) তালুকিস্বত্বকে জমিদারির ন্যায় মালিকানাস্বত্বে (উপরিস্থ স্বত্বে) পরিণত করা হয়। বাকিগুলো সাধারণ (মাজকুরি) মধ্যস্বত্ব হিসেবে টিকে থাকে। পরবর্তীকালে সারা ব্রিটিশ আমল জুড়ে গ্রামবাংলায় বহু প্রকৃতির অজস্র মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি হয়। এ সকল মধ্যস্বত্বের আইনগত এবং প্রথাগত প্রকৃতি ও পরিধি ছিল বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন এলাকার জমিদার ও তালুকদারগণ রায়তকুল হতে সহজ উপায়ে নিয়মিত এবং সর্বাধিক খাজনা আদায়ের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান, যোগাযোগ,জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং স্থানীয় কৃষিব্যবস্থা ও জলবায়ু সংক্রান্ত সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে এগুলো সৃষ্টি করেন। এভাবে কালক্রমে জমিদার ও রায়তের মাঝে বহুধাপে বিভিন্নধরনের মধ্যস্বত্বের আবির্ভাব ঘটে।

ময়মনসিংহ জেলায় জমিদারির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য জেলার সমপর্যায়ের হলেও সারাদেশের মধ্যে বৃহদায়তনের (২০,০০০ একরের উর্ধ্বে) জমিদারি ছিল ময়মনসিংহে সর্বাধিক।[২] তবে আয়তনে বড়ো হলেও এগুলোর সচ্ছলতা খুব বেশি ছিল না[৩]। নিলাম, ক্রয়-বিক্রয়, দান ইত্যাদির মাধ্যমে জমিদারিস্বত্ব হস্তান্তর প্রচলিত থাকলেও বৃহৎ হিন্দু জমিদারিগুলোর মালিকানা পরিবর্তন ছিল মূলত উত্তরাধিকারসূত্রে এবং প্রায়শ উত্তরাধিকার প্রক্রিয়া ছিল দত্তক পুত্রভিত্তিক।[৪] এ কারণে দেখা যায় বৃহৎ হিন্দু জমিদারিগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একক মালিকানাধীন থেকেছে এবং প্রভাব প্রতিপত্তি ও আর্থিক সচ্ছলতা সমুন্নত রাখতে সমর্থ হয়েছে।

ইংরেজ শাসনের প্রথমভাগে বিজয়ী ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি বিজিত মুসলমানদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। সমৃদ্ধ মুসলমান পরিবারগুলোর প্রতি তাদের সন্দেহ ছিল সীমাতীত। আবার শাসনক্ষমতা হারিয়ে মুসলমানগণও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইংরেজদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণাবশত সর্বপর্যায়ে ছিল তাদের সংশ্রববর্জিত। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে ও বিরূপ অবস্থানের ফলে মুসলমান সচ্ছল পরিবারগুলো ব্রিটিশ আগ্রাসনে বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, ব্রিটিশ শাসনের প্রথমভাগে ব্যাপকভাবে লাখেরাজভূমি বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলিম জমিদারিগুলো আর্থিকভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এগুলো ব্রিটিশ শাসনে বর্ধিতহারে রাজস্ব প্রদানের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। উপরন্তু মুসলিম জমিদারিগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে ছিল বহুধাবিভক্ত। জমিদারগণের বহুবিবাহ ও অধিক সন্তান-সন্ততি ছিল এর মূল কারণ। তা ছাড়া রাজনীতির এতবড় পটপরিবর্তনেও পূর্বানুসৃত ভোগবিলাসিতা বজায় রাখায় অনিয়ন্ত্রিত ব্যয়নির্বাহের কারণে মুসলিম মালিকানাধীন জমিদারিগুলো ছিল ক্ষয়িষ্ণু। তদুপরি, ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজি শিক্ষাসহ ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি অনীহা ইত্যাদি কারণেও মুসলমান জমিদার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর হিন্দুদের মতো ব্রিটিশ শাসকশ্রেণির সাথে চলাফেরা ও

---

২ W.H. Grimley, *Report on Land Revenue System of Bengal & Bihar*, Board of Revenue, Calcutta 1883, p. 5 (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)

৩ *Gazetteers, Mymensingh*, p. 61

৪ *Ibid*.

সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেনি। ফলে শাসকশ্রেণির সহানুভূতি অর্জনে মুসলিম জমিদারিগুলো ব্যর্থ হয়। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে ময়মনসিংহ এলাকায় সমৃদ্ধ মুসলিম জমিদারি (উদাহরণস্বরূপ, আটিয়া, হাজরাদি, কাগমারি, জয়নশাহি ইত্যাদি) থাকলেও শেষ দিকে বেশিরভাগ মুসলিম জমিদারিই চরম দরিদ্রতায় নিপতিত হয়ে নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। ময়মনসিংহের জমিদারি প্রসঙ্গে ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দের *Annual Administration Reports of Commissioners of Divisions*-এর ময়মনসিংহের জমিদার সম্পর্কে বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়[৫] "….Two or three points appear worthy of notice with regard to the district zemindars in general. *First*, that though so large a proportion of the population are Mahomedan, only two or three of the large zemindars hold the Mahomedan faith; *secondly*, that a very considerable number of the present zemindars are woman; and *thirdly*, that though the existing zemindars mostly represent old families, a great many of them attained their present position by adoption, and not by birth."

এ গ্রন্থে বিবেচ্য সময়ে (শতাধিক বছরে) হিন্দু ও মুসলিম জমিদারিগুলোর ও মধ্যস্বত্বভোগীর হার ও সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি ময়মনসিংহ জেলার বড়ো জমিদারদের অধিকাংশই তাদের জমিদারি নায়েব, গোমস্তা ও আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করে। জমিদারগণ নিজেরা অনুপস্থিত থাকায় জমিদারির আমলা গোমস্তারাই বাস্তব অর্থে (De facto) জমিদার বনে যায়। ফলে জমিদারি আমলাদের খেয়াল খুশির ওপর রায়ত প্রজাদের সুখশান্তি ও নিয়তি ন্যস্ত হয়ে যায়। তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জমিদার যেমন মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত, রামগোপালপুরের রাজা কিংবা সন্তোষের ছয় আনি জমিদারির রানি, তারা ছিলেন এর ব্যতিক্রম।[৬] ময়মনসিংহের জমিদারিগুলোর এসমস্ত দিক ছাড়াও তালুকদারি ও রায়তিস্বত্বগুলোর অবস্থা কী ছিল তাও এ গবেষণায় উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

জমিদার শ্রেণির নিচে ছিল বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার শ্রেণি। তারা মূলত গ্রামেই বসবাস করত। তারা কৃষক প্রজাদের (রায়ত) নিকট থেকে খাজনা আদায় করত এবং অনেক ক্ষেত্রে জমিদার ও কৃষক প্রজার মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করত। তবে রায়ত শোষণে তারাও পিছপা ছিল না।

ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল রায়তশ্রেণির স্বল্প প্রকারভেদ। রায়তি স্বত্ব মূলত ছিল জোত ও কয়েক শ্রেণির নিষ্কর স্বত্বে সীমিত। রায়তশ্রেণি জমিদারের খাজনা বছরে ৪-১২ কিস্তিতে পরিশোধ করত। মূলত নগদ টাকায় খাজনা পরিশোধযোগ্য ছিল। তবে সুসঙ্গ পরগনার কোনো কোনো এলাকায় খাজনা ছিল ধান্যে। এ রায়তি স্বত্বের শ্রেণি ছিল 'ধান্যকরারী'। নিম্নরায়তি স্বত্ব ছিল মূলত বর্গা ও কোর্ফা স্বত্ব। জমিদার, নানা প্রকারের মধ্যস্বত্ব ও রায়তশ্রেণির মধ্যে খাজনা আকারে উৎপাদিত ফসলের বণ্টন, প্রকারভেদ, সরকার প্রণীত আইনের প্রভাব এবং আর্থসামাজিক জীবনে এর বৈচিত্র্যময় মিথস্ক্রিয়া এ গবেষণাগ্রন্থে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে এবং পরে বাংলার বড়ো বড়ো বেশ কিছু জমিদারির পতন ঘটে। সেক্ষেত্রে ময়মনসিংহের জমিদারিগুলোর কী পরিণতি হয়েছিল তা স্বল্প পরিসরে এ গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪৮ নং রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক প্রতি জেলার রাজস্ব প্রদায়ী এস্টেটসমূহের বিবরণী সম্বলিত পঞ্চসনা রেজিস্টার বা Quinquennial Register প্রস্তুত করা হয়। এ রেজিস্টারের প্রতি পাতা জেলা কালেক্টর

---

৫ *The Zemindary Settlement of Bengal 1879* (first published), Low Price Edition, Delhi 1995 (Reproduced) Appendix-XIII, pp. 319-320

৬ *Gazetteers, Mymensingh*, p. 61

ও জজ কর্তৃক সত্যায়ন করা হয়। ময়মনসিংহ কালেক্টরেট রেকর্ডরুমে ৬ ভলিয়ুমে এ রেজিস্টার সংরক্ষিত রয়েছে। এ রেজিস্টার প্রাপ্তির ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালীন ময়মনসিংহের জমিদারিসমূহের প্রকৃত বিবরণী সম্বলিত তথ্যাদি সংগ্রহ করার সম্ভব হয়েছে।

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের পর সরকার জমিদারদের স্বার্থরক্ষায় বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে। এতে জমিদারদের রাজস্ব আদায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও রায়তপ্রজা চরম দারিদ্র্য অবস্থায় পতিত হয়। কোম্পানির অপশাসন ও জমিদার তালুকদারদের অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, বলাকী শাহের বিদ্রোহ, পাবনায় পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ ইত্যাদি ব্রিটিশ শাসনকে কাঁপিয়ে তুলে। বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত এ সমস্ত আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন প্রকৃতির মনে হলেও এগুলোর মূল উৎস ছিল বাংলার নির্যাতিত কৃষক সমাজ।

দেশব্যাপী জমিদার ও জমিদারের আমলা গোমস্তার অমানবিক রায়ত শোষণ ও নির্যাতন, খোদ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত বিদ্রোহ ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কৃষকদের স্বার্থে সর্বপ্রথম খাজনা আইন, ১৮৫৯ প্রণয়ন করে। পাশাপাশি ভূমির ওপর মালিকানা নির্ণয়ার্থে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা বাংলায় 'থাকবস্ত' ও 'রাজস্ব জরিপ' পরিচালিত হয়। এ দুটি জরিপে 'রায়তি স্বত্ব' রেকর্ড করা না হলেও জমিদারিসমূহের সীমানা-আয়তন ও মালিকদের এবং মৌজা সংক্রান্ত তথ্যাদি রেকর্ড করা হয়। ময়মনসিংহ জেলায় ১৮৫৪ হতে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে থাকবস্ত জরিপ এবং ১৮৫৫ হতে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজস্ব জরিপ পরিচালিত হয়। এ দুটি জরিপের পর পরই 'পরগনাওয়ার' ও 'মহালওয়ার রেজিস্টার' প্রণয়ন করা হয় এবং জমিদারিসমূহের তথ্যাদি এ রেজিস্টার দুটিতে রেকর্ড করা হয়। এগুলিই বাংলার জমিদারিসমূহের জরিপক্রমে প্রথম রেজিস্টারভুক্ত তালিকা। পরবর্তীকালে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয় এবং এর আওতায় ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ময়মনসিংহে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সি.এস. জরিপ পরিচালিত হয়। এমতাবস্থায় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপমূলে প্রাপ্ত ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্বের তালিকা, ভূমিস্বত্বের প্রকৃতি, আকার, প্রকার, পরিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে দালিলিক তথ্য এ গবেষণাগ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সৃষ্ট জমিদারি প্রথা এক পর্যায়ে খোদ ব্রিটিশ শাসকবর্গের কাছেই অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারি উচ্ছেদকল্পে ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে The Land Revenue Commission গঠন করা হয়। কমিশন ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপের সুপারিশ করে। সর্বশেষে পাকিস্তান সৃষ্টির পর জমিদারি উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে The East Bengal State Acquisition And Tenancy Act, ১৯৫০ প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিকভাবে এ আইনের আওতায় ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রথমে ১৭টি বড়ো জমিদারি সরকারি দখলে আনয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু মামলামোকদ্দমার কারণে জমিদারি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে দেশের সকল জমিদারি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জমিদারিসমূহের অধিগ্রহণের বিশদ বিবরণী ১৯৫১-১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে 'দি ঢাকা গেজেটিয়ার'-এর ভলিউমসমূহে প্রকাশিত হয়েছে।

ময়মনসিংহে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক সংক্ষিপ্ত জরিপ (যা এস এ জরিপ হিসেবে পরিচিত) পরিচালনা করা হয়। এ জরিপে জমিদারদের অধিগ্রহণকৃত জমিদারি বাবদ ক্ষতিপূরণ তালিকা (Compensation Assessment Roll) প্রণয়ন করা হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট জমিদারির অধীনস্থ রায়তের নাম, জমির বিবরণ, খাজনার পরিমাণ সম্বলিত তালিকাও প্রস্তুত করা হয়। জমিদারের ক্ষতিপূরণ তালিকা প্রণয়নের পর রায়তের বিবরণ সম্বলিত স্বত্বলিপি তালিকাটি এস. এ. খতিয়ান হিসেবে গণ্য হয় এবং এটি কালেক্টরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশের ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনায় উপরিল্লিখিত যুগান্তকারী ঘটনাবলীর আলোকে ময়মনসিংহ জেলার জমিদারি ও অন্যান্য ভূমিস্বত্বের ওপর যে প্রভাব ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এতে জমিদারি ও ভূমিস্বত্ব প্রক্রিয়া যেভাবে আবর্তিত হয়েছে এগুলোর নানান তথ্য উদঘাটন ও বিশ্লেষণ করাই এ গবেষণাগ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং ময়মনসিংহ রেকর্ডরুম ও অন্যত্র ডকুমেন্ট আকারে এসকল তথ্য পাওয়া সম্ভব বিবেচনায় তা এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণা বিষয়ের ব্যাপ্তিকাল

১৮৫৪-১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহে পরিচালিত থাকবাস্ত জরিপ ও রাজস্ব জরিপ ও এগুলোর ভিত্তিতে প্রণীত পরগনাওয়ার ও মৌজাওয়ার রেজিস্টারসমূহ, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় ময়মনসিংহে ১৯০৮-১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে (সি. এস জরিপ) ও এতদমূলে প্রণীত সি. এস. রেকর্ড (স্বত্বলিপি), ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় ময়মনসিংহে জমিদারিসমূহ অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ প্রদান ও এতদমূলে প্রণীত সি. এ. রোল (ক্ষতিপূরণ তালিকা), ১৯৫৫-১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহে পরিচালিত স্টেট একুইজিশন সার্ভে (এস. এ. জরিপ) ও এতদমূলে প্রণীত এস. এ. রেকর্ড (স্বত্বলিপি) এবং উক্ত সময়ে সৃষ্ঠ জমিদারি ও ভূমিসংক্রান্ত অন্যান্য নথিপত্রাদি, রেজিস্টার, রিপোর্ট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি ইত্যাদি সকলই এ গবেষণাগ্রন্থের জন্য প্রাইমারি ডকুমেন্ট এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সকল ডকুমেন্ট ময়মনসিংহ কালেক্টরেট রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত রয়েছে বিধায় এবং এগুলো হতে এ গবেষণাগ্রন্থের মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ সম্ভব হবে বিবেচনায় গবেষণা বিষয়ের সময়কাল ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস, গবেষণা পদ্ধতি ও ব্যাপ্তি

ময়মনসিংহ জেলার ওপর বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে শ্রী কেদারনাথ মজুমদার লিখিত দুটি গ্রন্থ যথা *ময়মনসিংহের ইতিহাস* এবং *ময়মনসিংহের বিবরণ*, শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী রচিত *ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার* (১ম ও ২য় খণ্ড), শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী রচিত *সেরপুরের বিবরণ* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। F.A Sachse রচিত *Bengal District Gazetteer Mymensingh* এবং নূরুল ইসলাম খান সম্পাদিত *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার*, *বৃহত্তর ময়মনসিংহ* আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। তা ছাড়া F.A Sachse রচিত *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Mymensing 1908-1919* এবং R.W. Bastin কর্তৃক রচিত *Final Report of the Settlement Operation in Five Thanas of the Partially Excluded Area of Mymensing 1938-42* তেও ময়মনসিংহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। শ্রী কেদারনাথ মজুমদার কর্তৃক রচিত *ময়মনসিংহের বিবরণ* ও *ময়মনসিংহের ইতিহাস* গ্রন্থ দুটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য। *ময়মনসিংহের বিবরণ* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে, *ময়মনসিংহের ইতিহাস* প্রকাশিত হয় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে। এ দুটি গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করা হয় ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলার দ্বিশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে। এ দুটি গ্রন্থে ময়মনসিংহের পরগনাভিত্তিক জমিদারিগুলোর পরিচিতি ও হস্তান্তর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যায়। শ্রী শৌরীন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী রচিত *ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার* প্রথম খণ্ড কলকাতা হতে প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে। প্রথম খণ্ডে ময়মনসিংহ পরগনার ঐতিহাসিক বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সুসঙ্গ পরগনার ঐতিহাসিক বিবরণাদি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থ দুটিও নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। শ্রী হরচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত *সেরপুরের বিবরণ* প্রকাশিত হয়েছে ১২৭৯ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে। এটিও একটি

প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। F.A Sachse কর্তৃক রচিত *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Mymensing 1908-1919* এবং R.W. Bastin কর্তৃক রচিত *Final Report of the Settlement Operation in Five Thanas of the Partially Excluded Area of Mymensing 1938-42* গ্রন্থ দুটি উল্লিখিত দুটি জরিপের Final Report এবং এগুলো সরকারি রিপোর্ট। তা ছাড়া উপর্যুক্ত গেজেটিয়ার দুটিও সরকারি প্রকাশনা। কাজেই এগুলোও নির্ভরযোগ্য। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন গবেষক ও লেখক ময়মনসিংহের ওপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে এগুলো পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য না হলেও অনেক হারিয়ে যাওয়া সূত্র (Missing Link) এগুলো হতে উদ্‌ঘাটন করা যায়। এ সমস্ত গ্রন্থে নানা বিষয়ের বর্ণনায় ভূমিস্বত্বের বিষয়টিও স্বল্প পরিসরে আলোচিত হয়েছে। তবে কোনো গ্রন্থেই বা সরকারি রিপোর্টে বা জানামতে কোনো গবেষণায় ময়মনসিংহের জমিদারি ও ভূমিস্বত্বের নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়নি।

যদিও ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ময়মনসিংহের জমিদারি ও ভূমিস্বত্ব এ গবেষণার বিষয়বস্তু দেখানো হয়েছে, ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্বের ইতিহাস কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে মোগল আমল বিশেষ করে নবাবি আমল থেকে। গবেষণার এক পর্যায়ে সৌভাগ্যক্রমে ময়মনসিংহ কালেক্টরেট রেকর্ডরুমে ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তুতকৃত মূল পঞ্চসনা রেজিস্টার (Quinquennial Register; ৬টি খন্ডে সমাপ্ত) অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এ রেজিস্টারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পর তৎকালীন ময়মনসিংহের সকল জমিদারি ও এস্টেটসমূহের নাম, আয়তন, জমিদার/মালিকের নাম, সরকারি রাজস্ব ইত্যাদি সমন্বিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর কাল ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে হলেও এ গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টারটি পাওয়ার ফলে বাস্তব কারণে ময়মনসিংহের ভূমিস্বত্বের সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ নেয়া হয়েছে ব্রিটিশ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কাল অর্থাৎ ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে। ১৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দের "*পঞ্চসনা রেজিস্টার*" (যা *Quinquennial Register* হিসেবে পরিচিত), ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে প্রচলিত "*পরগনাওয়ার*" ও "*মহালওয়ার রেজিস্টার*", ১৯০৯ হতে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দব্যাপী পরিচালিত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে দ্বারা প্রণীত রেকর্ড অব রাইটস (সি. এস রেকর্ড), লাখেরাজ, খাস ইত্যাদি ভূমি সংক্রান্ত রেজিস্টার, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দব্যাপী পরিচালিত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ জরিপ (State Acquisition Survey) বা এস. এ. জরিপ দ্বারা প্রণীত সংক্ষিপ্ত এস এ রেকর্ড ও *সি. এ. রোল (Compensation Assessment Roll)*, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে "দি ঢাকা গেজেটিয়ারে" প্রকাশিত সরকারি প্রজ্ঞাপন আকারে অধিগ্রহণকৃত জমিদারিসমূহের মালিকানা ও সম্পত্তির তফসিল, Board of Revenue প্রণীত বিশদ বিবরণী, *Report of the Wards, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal* এর বাৎসরিক প্রকাশনাসমূহ, *Report on the Land Revenue Administration of the Lower Provinces*-এর বাৎসরিক প্রকাশনাসমূহ, *Annual General Admisistration Report of The Dacca Division*-এর বাৎসরিক প্রকাশনা সমূহ, *Bengal District Gazetteer, B. Volume, Mymensing, District Statistics*-এর ৩টি volume (1900-1911, 1911-21, 1921-1931) ইত্যাদি এ গ্রন্থের জন্য মৌলিক বা প্রাথমিক উৎস (Primary Source)। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল, জেলা রেকর্ডরুম ও বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভসে রক্ষিত নথিপত্র, বিভিন্ন সময়ে প্রণীত সরকারি রিপোর্টসমূহ, জমিদারি কাছারির কাগজপত্র ইত্যাদিও গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাপত্র, গ্রন্থাদি, জার্নাল ইত্যাদি Secondary এবং Tertiary Source হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার ইতিহাস সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থ রচিত হলেও এগুলোতে জেলার ভূমিস্বত্বের ওপর বিচ্ছিন্নভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছাড়া পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ বিবরণী নেই। তা ছাড়া ভূমিস্বত্ব সম্পর্কিত সরকারি ডকুমেন্টস, রেজিস্টার ইত্যাদি কাগজপত্রাদি শতাব্দীব্যাপী অযত্নে অবহেলায় বিভিন্ন কার্যালয়ে যত্রতত্র অগোছালো

অবস্থায় কিছু পড়ে আছে, কিছু ইতোমধ্যে বিনষ্ট হয়েছে এবং কিছু বিনষ্ট হওয়ার পথে। বাংলাদেশ আর্কাইভসে কিছু ডকুমেন্টস সংরক্ষণ করা হলেও এগুলোতে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। জমিদারিসমূহের কাছারি ও সেরেস্তায় জমিদারির নিজস্ব ডকুমেন্টসমূহের অধিকাংশই ইতোমধ্যে স্ব স্ব এলাকায় বিনষ্ট হয়েছে অথবা হারিয়ে গেছে এবং সরকারি মহাফেজখানায় যেগুলো আনা হয়েছিল, এগুলোও সুষ্ঠু সংরক্ষণের অভাবে অগোছালো, জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থে এ সকল স্থানের সকল উৎস হতেই বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক সম্ভাব্য সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এ গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে তার সিংহভাগই প্রাথমিক উৎস (Primary Source) অর্থাৎ মূল সরকারি ও মূল জমিদারি রেকর্ডপত্র (Official & Zemindary Documents) হতে গৃহীত।

এ গবেষণাগ্রন্থে ময়মনসিংহ জেলা রেকর্ডরুম, বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস, বাংলাদেশ সচিবালয়, বিভিন্ন জেলা এবং অন্যান্য স্থানে রক্ষিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল, রেজিস্টার, রেকর্ড, নিদর্শন ইত্যাদি প্রাথমিক (Primary) উৎসসমূহ হতে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি আহরণ করা হয়েছে তেমনি এতদসংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ, গবেষণাপত্র, প্রামাণ্যপত্র ইত্যাদি অপ্রধান (Secondary & Tertiary) উৎস হতেও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমিদারবংশীয় এবং জমিদারির প্রধান কর্মচারী/ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাও গ্রহণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহ কালেক্টরেট রেকর্ডরুমে রক্ষিত জমিদারিগুলোর নিজস্ব অফিস ডকুমেন্টস হতে জমিদারির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। জমিদার, মধ্যস্বত্ব ও রায়তিস্বত্বের মধ্যে জমির মালিকানা ও স্বার্থ বিভাজন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে ১৯০৯-১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে পরিচালিত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা সি. এস. জরিপে প্রণীত স্বত্বলিপি (Record of Rights বা ROR) হতে। এজন্য ময়মনসিংহ জেলার প্রধান ১৪টি পরগনা নির্বাচনপূর্বক প্রতি পরগনায় একটি মৌজা রেকর্ড (ROR) বা স্বত্বলিপি কেইস স্টাডি করে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেইস স্টাডিতে দৈবচয়নের (Random Sampling) মাধ্যমে মৌজা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত মতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থে ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্বের একটি অবকাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। চলমান ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ শাসনামলে বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী সময়ে ময়মনসিংহের পরগনাওয়ারি জমিদারিসমূহের অধিক্ষেত্র, মালিকানা হস্তান্তর এবং স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব পরিচালন প্রক্রিয়া বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। 'কোম্পানির নিয়মিত রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা এবং কোম্পানির একটি অনুগত শক্তিশালী সামাজিক শক্তি হিসেবে জমিদারদের প্রতিষ্ঠিতকরণ' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এ দুটি উদ্দেশ্য সাধনে সময়ে সময়ে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ও ময়মনসিংহ জেলার কৃষক, প্রজা রায়তের আর্থসামাজিক অবস্থানের উপর এগুলোর যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে এবং এতে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের আচরণ ও রায়তকুলের যে প্রতিক্রিয়া সেগুলোও এ গবেষণায় সীমিত পরিসরে আলোচিত হয়েছে। ভূমিস্বত্ব পরিচালনা ব্যবস্থায় জমিদারদের অবৈধ কার্যকলাপ ও অমানবিক আচরণের কারণে জমিদার রায়ত সম্পর্কের যে অস্থিরতা বিরাজ করত তা-ও সীমিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন ভূমি ছাড়াও অস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সরকারি খাস মহলের জমির মালিকানাও এ গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত এস. এ. জরিপ ও ক্ষতিপূরণ তালিকা হতে জমিদারি উচ্ছেদের সময় জমিদারিসমূহের মালিকানা, রাজস্ব ও ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এ গবেষণায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিটি পরগনার মৌজা রেকর্ড নিয়ে কেইস স্টাডির মাধ্যমে মৌজার জমিদার, মধ্যস্বত্বাধিকারী ও রায়ত এ তিন ভূমিস্বত্বের ধরন, ধর্মীয় বিন্যাস, খাজনার পরিমাণ ও হার ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহে সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জমিদারির অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। জমিদারির অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ব্যবস্থার ওপর সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে ময়মনসিংহের বিখ্যাত জমিদারি "মহারাজা এস্টেটের" ওপর কেইস স্টাডি করা

হয়েছে। এতে মহারাজা এস্টেটের খাজনা আদায় ব্যবস্থা, কর্মচারী প্রশাসন ও বাৎসরিক বাজেট সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন উৎস হতে যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্য সমন্বয়ে ১৮৫৪ হতে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ এ সময়কালে ময়মনসিংহ জেলার ভূমিস্বত্ব কাঠামো গঠন করে ভূমিস্বত্ব অঙ্গনের খেটে খাওয়া মানুষের উৎপাদিত ফসলের ওপর নানা ধরনের ভূস্বামীদের ভাগবাঁটোয়ারার খতিয়ান, সরকার প্রণীত আইনকানুনের প্রভাব, ভূস্বামীদের পরিবর্তন এবং পরিশেষে জমিদারি স্বত্বের বিলুপ্তি ও প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ঐতিহ্যবাহী জমিদারিগুলোর মৌজাভিত্তিক মালিকানা ও মালিকানা পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণী বিশদভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ময়মনসিংহের যে কোন স্থানের যে কোন নির্দিষ্ট সময়ে জমিদারি মালিকানা কার ছিল তা এ গ্রন্থ পাঠে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে।

যে জমিদার তালুকদারদের ঘিরে গ্রামবাংলার মানুষের জীবন শতাধিক বছর আবর্তিত হয়েছে, তাদের কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জেলার বর্তমান প্রজন্মের কাছে অতি মূল্যবান। তা ছাড়া একথা সত্য যে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত নানামুখী আইনের জটিল আবর্তে গ্রামবাংলার সকল শ্রেণির মানুষ নানা হয়রানিতে শতাব্দীরও অধিককাল অতিবাহিত করে। তাদের আর্থসামাজিক জীবন প্রগতিহীন এক অচলায়তনে বাঁধা পড়ে যায়। জাতির আর্থসামাজিক জীবন একই জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে এ গবেষণায় তুলে আনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে শুধু ভূমি খাতে জাতীয় সামর্থ্যের পুরো অংশ নিবিষ্ট থাকার ফলে আর্থসামাজিক জীবনের স্থবিরতা দেশের শিল্পায়ন ও অগ্রগতির সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে। পাশাপাশি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে জমিদারগণ কৃষিতে বিনিয়োগ করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটাবেন মর্মে লর্ড কর্নওয়ালিস যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন তা ময়মনসিংহে নিষ্ফল হয়। ময়মনসিংহে যে কৃষি এবং কৃষকের উন্নতি হয়নি তা এ গবেষণায় প্রতিভাত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষের বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিকানা স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে ন্যস্ত করায় জাতীয় অর্থনীতিতে যে অচলাবস্থা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে এবং এতে যে জাতীয় অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা শতাধিক বছর ধরে স্থবির হয়ে যেতে পারে ব্রিটিশ শাসনকাল তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ প্রগতির জন্য এ ইতিহাস জানা একান্ত আবশ্যক। উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা জনবহুল ময়মনসিংহ জেলার এ সমস্ত তথ্য বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়।

Bengal
(1874-1947)
Assam
Darjeeling
Jalpaiguri
Rangpur
Assam
Malda
Bogra
Mymensingh
Sylhet
Bihar
Rajshahi
Tripura
Murshid
abad
Dacca
&
Birbhum
Nadia
Tippera
Burdwan
Faridpur
Orissa
Jessore
Hill
Tracts
Bankura
Hooghly
Khulna
Bakar
ganj
Howrah
24
Parganas
Noakhli
Midnapore
Chittagong
Myanmar
Bay of Bengal

উৎস ঃ Statistical Pocket book of Bangladesh January,2005

ময়মনসিংহ জেলা

গারো পাহাড় (ভারত)
রাজশাহী বিভাগ
সুনামগঞ্জ
গাজীপুর
নরসিংদী
মানিকগঞ্জ
বক্সিগঞ্জ
দেওয়ানগঞ্জ
ঝিনাইগাতি
শ্রীবর্দী
নলিতাবাড়ী
ইসলামপুর
হালুয়াঘাট
ধোবাউড়া
দুর্গাপুর
কলমাকান্দা
মেলানদহ
শেরপুর
নকলা
পূর্বধলা
ফুলপুর
বড়হাট্টা
মাদারগঞ্জ
জামালপুর
নেত্রকোনা
মোহনগঞ্জ
সরিষাবাড়ী
মুক্তাগাছা
ময়মনসিংহ
ক্ষীরীপুর
আটপাড়া
মধুপুর
কেন্দুয়া
মদন
ঝালিয়াজুরী
ইশ্বরগঞ্জ
গোপালপুর
ফুলবাড়িয়া
ত্রিশাল
তারাইল
ইটনা
নান্দাইল
ভূয়াপুর
ঘাটাইল
হোসেনপুর
করিমগঞ্জ
মিঠামাইন
ভালুক
গফরগাঁও
কিশোরগঞ্জ
কালীহাতী
পাকুন্দিয়া
কটিয়াদি
নিকলী
টাঙ্গাইল
বাসাইল
সখীপুর
বাজিতপুর
দেলদুয়ার
কুলিয়ারচর
মির্জাপুর
ভৈরব
নাগরপুর